

আয়ুধ

২০২১

তথ্যশিল্পে পত্রিকা



বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

সৃষ্টি

আয়ুধ

- শুরুর কথা
- অবনীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য
জয় বিশ্বাস
- অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর স্মরণে
অনন্যা দেঁড়ে(মালাকার)

নিবন্ধ

- অবনীন্দ্রনাথের রাধা এবং একটি কথোপকথন
কৌস্তভ কুমার ঘোষ
- স্বদেশীকতার প্রতীকরূপে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা চিত্র
শুভজিৎ দাস
- বাংলা চিত্রকলা চর্চায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নাফিসা খাতুন
- গদ্য শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ
নূরনেহার বেগম
- লোকসংস্কৃতির অন্তরাতে 'বাংলার ব্রত'
সুশান্ত পাত্র
- চিত্র শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ
মৌমি সাহা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

আয়ুধ

রেখায় রেখায়

- সুস্মিতা দাস
- সৌমিলি দাস
- মৌ ঘোষ
- মনিদীপা কর্মকার

ফিরে পড়া

- অবনীন্দ্রনাথের "বাংলার ব্রত"
সমতা ভৌমিক
- অবনীন্দ্রনাথের "ক্ষীরের পুতুল"
অভি দাস

প্রচ্ছদ শিল্পী

সুস্মিতা দাস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

আয়ুধ

নিবন্ধ

তথ্যগোষ্ঠী পত্রিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকীয় নিবেদন

প্রতিবছর আমাদের বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয় এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে 'আয়ুধ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই বছর আমরা একটি কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছি আমাদের জীবন এবং জীবনের সঙ্গে জড়িত সকল ক্রিয়াকলাপ। সেই পরিস্থিতিকে প্রতিহত করে হার না স্বীকার করে অনলাইন পত্রিকা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিভাগের পক্ষ থেকে। বর্তমান পরিস্থিতি বড়োই উদ্দিগ্নের। এই উদ্দিগ্নতা থেকে আমাদের মাথায় নানা রকম চিন্তা - ভাবনা উপস্থিত হয়। আর সেই চিন্তা ও ভাবনার ফলপ্রসূ হিসেবে আমরা হাতে তুলে নিই কলম।

এই বছর আমাদের পত্রিকার বিষয় হলো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্থশতবর্ষ এই বছর তাই আমাদের বিষয় নির্বাচন করাও সেই মানুষটিকে কেন্দ্র করে কারণ তাঁর নাম সাহিত্যের আউনায় কোনোদিন মুছেবে না। আমাদের দ্বারা তাঁর সম্পর্কে লেখাও যথোচিত হবে না কখনও। কিন্তু প্রয়াস করলেও কোনো কিছু ভুল হবে না এত আমাদের জানা বিষয়। এই কাজটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আমাদের অনেক ভুল হয়েছে। সেই ভুল - ত্রুটিগুলোকে মার্জনা করার নিবেদন রইলো।

সম্মতা ভৌমিক ও অভি দাস (সম্পাদক)

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

স্মরণে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আয়ুধ

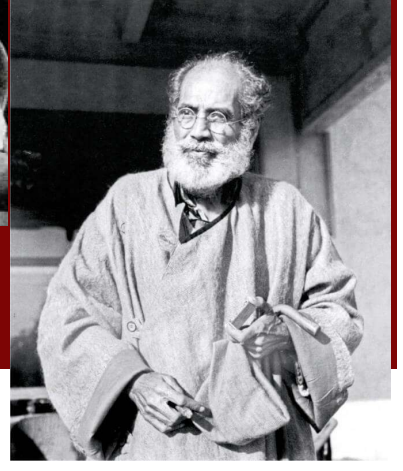


অনন্দোৎসব পত্রিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

অবনীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য

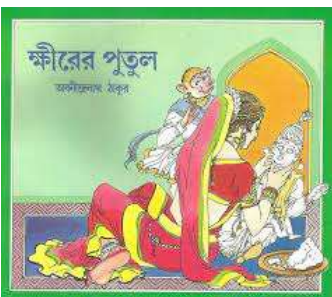
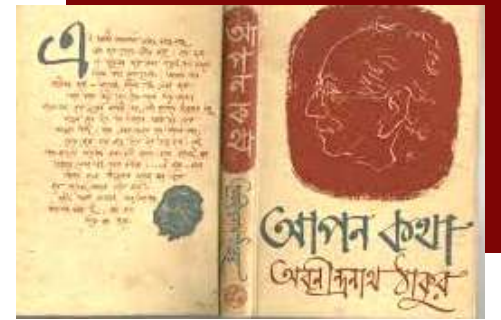
সংকলনে - জয় বিশ্বাস



- ভারতবর্ষের একজন খ্যাতিমান বাঙালি চিত্রশিল্পী হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যেমন একাধারে ছিলেন চিত্রশিল্পী অন্যধারে ছিলেন নন্দনতাত্ত্বিক এবং লেখক।
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ আগস্ট ১৮৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় দ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরে কনিষ্ঠপুত্র। দাদা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর মাতা সৌদামিনী দেবী (ঠাকুর)।
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ ও পিতা ছিলেন একাডেমিক নিয়মে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী। এর সুবাদে শৈশবেই চিত্রকলার আবেহে বেড়ে ওঠেন তিনি। ১৮৮৯ থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৯ সালেই তিনি সুহাসিনী দেবীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৯৬ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯১৩ সালে লন্ডনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়; এবং তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে সি আই ই উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ লিটারেচার ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর আচার্য্য রূপে দায়িত্ব পালন করেন।
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কয়েকটি চিত্রশিল্প – বুদ্ধ ও সুজাতা (১৯০৯), কালীদাসের ঋতু সঙ্ঘার বিষয়ক চিত্রকলা (১৯০৯), ভারতমাতা (১৯০৫), শেষযাত্রা (১৯১৪) ইত্যাদি। জাপানি প্রভাবে তিনি অংকন করেন তাঁর অন্যতম খৈয়াম (১৯৩০) চিত্রাবলি।
- চিত্রসাধনের শেষ পর্যায়ে তাঁর শিল্পচিন্তা নতুন মাত্রা লাভ করে। গড়ে তোলেন কুটুম কাটাম- আকার নিষ্ঠ এক বিমূর্ত রূপসৃষ্টি।
- তার কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ—শুকুন্তলা (১৮৯৫), ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), রাজকাহিনী (১৯০৯), ভারতমাতা (১৯০৯), নালক (১৯১৬), খাজাঞ্চি খাতা (১৯২১), চিত্রাঙ্কর (১৯২৬), বসন্তের হিমালয়, প্রিয়দর্শিকা (১৯২৯), বুড়ো আংলা (১৯৪১), শিল্পায়ন (১৯৫৫), রং বেরং (১৯৫৮) ইত্যাদি।
- সহায়ক গ্রন্থ সম্পাদনা—। পশ্চিমবঙ্গ অবনীন্দ্র সংখ্যা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ১৪০২।
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী আনন্দ পাবলিশার্স-১৯৯৯।
- ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন।

লাভ্য তো অনুভব করি এবং চোখেও দেখি একসঙ্গে, অথচ জিনিসটা এমনই যে পাকাপাকি একটা ব্যাখ্যার মধ্যে ধরাছোঁয়া দিতে চায় না।

(শিল্পের একটা মূলমন্ত্রই হচ্ছে 'নালমিতিবিস্তরণে'। অতি বিস্তারে যে অপর্থাপ্ত রস থাকে, তা নয়। অমৃত হয় ফোঁটা, তৃপ্ত দেয় অফুরন্ত।)



অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর স্মরণে

অনন্যা দেঁড়ে (মালাকার)

যায় চলে যায় জীবন যৌবন মহাকালের টানে,
কর্মের স্মৃতির বেঁচে রয়, সব মানুষের প্রাণে।
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অতীত ইতিহাস,
সব মানুষের মর্মে তাইতো আজও করছে বাস।
দ্বারকা নাথ গেছেন চলে স্মৃতি রেখে মনে,
গর্বিত তার বংশ টিকে, চেনে বিশ্বজনে।
বিশ্বজোড়া খ্যাতি মানের বংশ তালিকায়,
অবনীন্দ্র নামটি আছে আপন মহিমায়।
তাহার কথা বলব কিছু জাগছে-আশা প্রাণে,
কৃতী জনের স্মরণেতে আনন্দ পাই মনে।
হেমহিয়ান অবনীন্দ্রনাথ আমার প্রণাম নিও,
তোমার কথা বলব কিছু আমায় আশীষ দিও।
অঙ্কন শিল্পে বিশ্বজোড়া আছে তোমার নাম,
শিল্পকর্মে বিশ্ববাসী দেয় যে তোমায় দাম।

তোমার কাজের খ্যাতি তোমায়, করলো প্রফেসর,
আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করলে দুই- এক বার।

তোমার কীর্তি শিল্প গাথা, ছড়ায় বিশ্বময়,
শিল্প জগৎ তোমায় চেনে, চেনে জগৎময়।

প্যারিস লন্ডন টোকিওতে তোমার শিল্পকলা,
প্রদর্শনী সুনাম ছড়ায় সেইতো অতীত বেলা।

প্রফেসর হ্যাভেল এবং ভগিনী নিবেদিতা,
সেই অতীতে তোমার যত,শুনত সকল কথা।



এদের দেওয়া উৎসাহ, আর সহযোগিতা পেয়ে,
অরিয়েন্টাল আর্ট কলেজেটি, গড়লে মন প্রাণ দিয়ে।
সার্থক হল শিল্পী জীবন, মহান শিল্পী তুমি,
তোমার নামে গর্বিত তাই, আজও ভারত ভূমি।

বিশ্বকবির উৎসাহতে, গল্প কবিতায়,
সুনাম তুমি ছড়িয়ে দিলে, দিলে বিশ্বময়।

অবাক করা লেখনীতে, হল আবির্ভাব,
শিল্পকলায় সমান আছে লেখনীতে ধার।

শকুন্তলা দুঃস্বপ্নের, প্রেম কাহিনী লিখে,
অবাক তুমি করেছ করেছিলে বিশ্ব কবিটি কে।

একে একে লিখেছিলে মন কাড়া সব বই,
পড়ে মানুষ আনন্দেতে করল যে হইচই।

রাজকাহিনী বুড় অ্যাংলো ভূত প্রেতানির দেশ,
লিখলে আরও অনেক পুঁথি হয় না বলে শেষ।

গুণীজনের গুণ গাঁথা পরশ মনির মত,
ঘুচায় আমার মনের ব্যথা অবিলতা যত।

যৎসামান্য তোমায় গুণের করলাম চর্চা আজ,
ভুল যদি হয় করো ক্ষমা নইলে পাব লাজ।

অবনীন্দ্রনাথের রাধা এবং একটি কথোপকথন

কৌস্তভ কুমার ঘোষ

অবনীন্দ্রনাথের কেরিয়ারে কৃষ্ণ-বিষয়ক দুটি সিরিজ আছে। প্রথমটি, 1890s-এর, নাম - "কৃষ্ণলীলা", ঊঁর প্রথমদিককার সিনক্রোটিক-ওরিয়েন্টাল স্টাইলে আঁকা - এই, তুই যেগুলো শেয়ার করেছিস, ওপরে।

আর দ্বিতীয়টি, ঊঁর শেষদিককার কাজ, 1930s-এ, স্বদেশী-পরবর্তী-সময়ে, বাংলার পল্লীচিত্রের স্টাইলে করা। নাম - "কৃষ্ণমঙ্গল"।

শুক্রবারের বৃষ্টিমাত সন্ধ্যায় অধ্যাপক পূর্বভারতের বাসায় বসে এই আলোচনাই করছিলেন।

অধ্যাপক: কৃষ্ণ মঙ্গলের কাজ গুলোতে পার্সিয়ানেট ইনফ্লুয়েন্স সরে গিয়ে এসেছে ইন্ডিজিনাইটি। লাইনগুলো অনেক বেশি বোল্ড, রাগেড।

জনৈক ছাত্র: অবনীন্দ্রনাথ শ্রীরাধাকে এত সাদা শাড়ি পরান কেন কে জানে!

অধ্যাপকের সহকারী দীপু: আমার ধারণা, ওটা ফার্সি ইনফ্লুয়েন্স। ওদের ছবিতে মেয়েরা প্রায়শই সাদা পরে।

জনৈক ছাত্র: ছবির নীচে পদ লেখার ধরনটাও ফার্সি স্টাইল?

অধ্যাপক : সে তো অবশ্যই। তা তোমার আর কী মনে হয় ঘোষ? (ছাত্রের প্রতি অবলোকন)

জনৈক ছাত্র: ঠিক জানিনা তবে আমার ধারণা, পশ্চিমের সংস্কৃতি অনুযায়ী সাদা পবিত্রতা শান্তি সরলতার প্রতীক। অন্যদিকে সাদা স্বর্গীয় অনুভূতি প্রদানে সক্ষম বলে মনে করেন মনস্তত্ত্ববিদরা। হয়তো এ ধরনের কিছু ভেবে অবনীন্দ্রনাথ সাদা পোশাকে দেখতে চেয়েছিলেন রাধাকে।

অনেক উপন্যাস নাটকেও কোনো স্বপ্নে বা ছবির পরী রাজকন্যা অঙ্গরাদের সাদা রঙের পোশাকেই দেখানো হয়। যেমন- পুতুল নাচের ইতিকথা।

অধ্যাপক-(স্মিতহাস্য)না। শ্বেতাভিসারিকাও বর্ষাভিসারের এক বিশেষ বস্ত্র। বর্ষার সুতীত্র ধারায়, দ্বিপ্রহরে অভিসারে বৃষ্টিতে তাঁকে কৃষ্ণ দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন। সেই গৌরী দেহ, সেই অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ আভা, একমাত্র সাদা বস্ত্র হলেই তো ফুটবে।

এছাড়াও আলোকময় সায়মসম্ভোগে, সন্ধ্যায় শ্বেতশাটি বস্ত্রের ব্যবহার আছে। এই অসাধারণ এরোটিকা এখানে আছে।

কিন্তু দীক্ষিত বৈষ্ণব কবির এ ভুয়ারিসম নয়। তাই এরোটিকা প্রোফেন নয়। তিনি সেই রাধাকে সাজাচ্ছেন, কেবল দাসীর ন্যায়, দাসী আণ্ডারলাইনড, কৃষ্ণের আনন্দের জন্য তৈরি করতে।

এবার মনে রাখতে হবে, অবন ঠাকুর, হিন্দু এবং খড়দার নিত্যানন্দর পাটে দীক্ষিত।

ছাত্র : (স্বগত) 'আচ্ছা, বুঝলাম'।

অধ্যাপক : রাধাকে কিন্ত কবি আঁকছেন না। নিজে নারী হয়ে গিয়ে, পুরুষোত্তমের জন্য সাজাচ্ছেন।

তিনি কী পাচ্ছেন? কৃষ্ণসেবাসুখ।

অধ্যাপকের সহকারী : অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টির এই সক্ষমতা সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন তার মেয়ে উমা দেবী "তার সাধনার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজেকে অন্য সব বিষয় থেকে আড়াল করে সাধনা করতেন না, সকল বিষয়ে নিজেকে মিলিয়ে, সকল ডাকে সাড়া দিয়েও নিজের কাজ ঠিক করে যেতেন হয় আঁকা নয় লেখা, লেখা তো নয় সেও তাঁর আঁকা, ভাষার রঙ দিয়ে"।

উমা দেবী: বাবার কথা, ১৯৯-১০২

ছাত্র : আচ্ছা, রাসপূর্ণিমায় কৃষ্ণের উদ্দেশে স্বামিনীজীর যে অভিসার, তা তো জ্যোৎস্নাভিসার বটেই। সেই অভিসারে শ্বেতবস্ত্রই পরিধেয়।

অধ্যাপক : জ্যোৎস্নাভিসারে শ্বেতবস্ত্র। আধুনিক উদাহরণ, পুরুষপক্ষে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের অভিসার। কৃষ্ণকান্তের উইল।

ছাত্র : ধন্যবাদ।

রসগোল্লার সদ্যবহারান্তে ছাত্রের প্রস্থান।।



স্বদেশীকতার প্রতীকরূপে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা চিত্র

শুভজিৎ দাস

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর(৭ আগস্ট ১৮৭১- ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১) একজন খ্যাতিমান ভারতীয় চিত্রশিল্পী নন্দনতাত্ত্বিক এবং লেখক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরে কনিষ্ঠপুত্র।সে দিক থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতৃব্য ছিলেন।



অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার পাঠ শুরু হয় তৎকালীন আর্ট স্কুলের শিক্ষক ইতালিয় শিল্পী গিলার্ডি'র কাছে তার কাছে অবনীন্দ্রনাথ শেখেন ড্রইং প্যাস্টেল ও জলরং। পরবর্তীতে ইংরেজ শিল্পী সি এল পামারের কাছে লাইভ স্টাডি তেলরং ইত্যাদি শিক্ষা অর্জন করেন। ভারতীয় রীতি অনুসারে চিত্রশিল্পের তিনি নব জন্মদাতা ভারতীয় রীতিতে তাঁর আঁকা প্রথম চিত্রাবলী "কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত"।

তাঁর আঁকা অন্যতম কালজয়ী সৃষ্টি হল "চতুর্ভূজা ভারতমাতা"(১৯০৫)। এই ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ হিন্দুদের সম্পদের দেবী লক্ষ্মীকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসিনীর বেশভূষায় চিত্রিত করেছেন ভারতমাতা হিসেবে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরি হচ্ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু আগে থেকেই দেশকে জননী রূপে অভিহিত করা হয়েছিল। সংস্কৃত "ভারতাম্বা" শব্দটি থেকেই ভারতমাতা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল। সংস্কৃতে মাকে "অম্বা" বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকেই ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা মাতৃত্বের আবেগকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে শুরু করেন।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভারতমাতা নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন যা মানুষের মনে প্রবল আবেগের সঞ্চার করে।

এর কয়েক বছর পর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম' গান রচনা করেন। এই গানের মধ্যে বঙ্কিম স্বদেশকে একটি মূর্তিমান জননীরূপে তুলে ধরেন। বঙ্কিমের ভাবগত, বিমূর্ত জননীরূপের ধারণাটিকেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতা চিত্রের মধ্য দিয়ে সহজবোধ্য, বোধগম্য এবং দৃশ্যমান করে তোলেন। এর ফলে জাতীয়তাবাদের আবেগ সর্বসাধারণের কাছে আরও সহজ ও বোধগম্য হয়ে যায়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করলে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই "ভারতমাতা" আঁকেন বলে জানা যায়।

ভারতমাতা চিত্রটির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলঃ-

ক)এটি জাপানী জলরঙের প্রকরণে অঙ্কিত।

খ)ছবিটিতে একজন সাধারণ নারী গেরুয়া পোষাক পরিহিত। তিনি চতুর্ভূজা। তার চারটি হাতের একটিতে রয়েছে সাদা কাপড়, যা তাঁত বস্ত্রের প্রতীক।আরেকটি হাতে রয়েছে ধানের শিষ, যা অন্নের প্রতীক,কৃষির প্রতীক বা আত্মনির্ভরতার প্রতীক।অন্য হাতে রয়েছে কণ্ঠীমালা,যা ধ্যান বা সাধনার প্রতীক।

প্রসঙ্গত বলে রাখা আবশ্যিক, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার তিনটি ধারা ছিলঃ-

বয়কট বা বিদেশী সামগ্রীকে বর্জন করা,

স্বদেশী অর্থাৎ দেশীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার করা অর্থাৎ স্বনির্ভর হয়ে ওঠা। এবং

জাতীয় শিক্ষা

স্বদেশী আন্দোলনের মূল 'স্বদেশী' ভাবনাটি অর্থাৎ আত্মনির্ভরতার মন্ত্রটি ভারতমাতার চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।অন্ন,বস্ত্র,শিক্ষাএবং সাধনার মধ্য দিয়ে "ব্যক্তি ও দেশ" তার সমস্ত পরনির্ভরশীলতা দূর করে প্রকৃত অর্থে আত্মনির্ভর ও স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে। এই সত্যের ভাবনাটিকেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতা ছবিটিতে তুলে ধরেছিলেন।

বাংলা চিত্রকলা চর্চায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

নাফিসা খাতুন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন খ্যাতিমান ভারতীয় চিত্রশিল্পী, নন্দনতাত্ত্বিক এবং লেখক ছিলেন। পিতামহ ও পিতা ছিলেন একাডেমিক নিয়মের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী। এ সুবাদে শৈশবেই চিত্রকলার আবহে বেড়ে ওঠেন তিনি।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল ঠাকুর বাড়ির দেওয়ালে দেখতেন তেলরঙের আঁকা 'মদন ভস্ম', 'কাদম্বরী' কিংবা দেবযানীর পটচিত্র 'শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ভক্ষণ', শকুন্তলার মতো চিত্রকর্ম বুলছে। এমন দেখতে দেখতেই ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের। একবার তোর ছোট্ট পিসে দিয়েছিল তাকে একটি হাঁসের ছবি। দেখেই প্রথমে কে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আর তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের টেবিলে সর্বদাই পড়ে থাকত ছবি আঁকার কাগজ, বিভিন্ন রঙের পেন্সিল। সেই রং বেরঙয়ের পেন্সিল দিয়ে রং করা হলো।

তবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলার পাঠ খানিকটা দেরিতে। ২৫ কিংবা ২৬ বছর বয়সের দিকে আর্ট স্কুলের শিক্ষক ইতালীয় শিল্পী গিলার্ডির কাছে। তার কাছে অবনীন্দ্রনাথ শিখেছিলেন ড্রয়িং, প্যাস্টেল ও জলরং। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন গিলার্ডির কাছে শিখছেন, ঠিক সে সময়ে কলকাতায় এলেন বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী সি এল পামার। তার কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিখলেন লাইফ স্টাডি, জলরং আর তেলরঙের ব্যবহার। ভারতীয় রীতিতে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা প্রথম চিত্রাবলি ছিল 'কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত'।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন ১৮৯৫ সালের দিকে। ১৮৯৭ সালে আঁকলেন শুল্লাভিসার-রাধার ছবি মাঝে রেখে উৎকীর্ণ কবি গোবিন্দ দাসের পঙক্তিমাল্য, যা ছিল পাশ্চাত্য নিয়মের সঙ্গে ভারতীয় রীতির নবতর সংশ্লেষণ; যোজন-বিয়োজন। ১৯০০ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে তার কৃষ্ণলীলা সিরিজ প্রদর্শিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ই বি হ্যাভেলের উদ্যোগে লর্ড কার্জনের দিল্লি দরবারে আরও দুটি প্রদর্শনী এবং লন্ডনের 'স্টুডিও' পত্রিকায় চিত্রালোচনা প্রকাশিত হলে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি প্রকাশ্যে এলো। তার আঁকা 'শাজাহানের অস্তিমকাল' ভীষণ খ্যাতনামা আলোকচিত্র। যেখানে আমরা দেখি মৃত্যুশয্যা শুয়ে আছেন সম্রাট শাহজাহান। আর তার পায়ের কাছে বসা তার কন্যা। এই ছবি অবনীন্দ্রনাথ আঁকেছিলেন ১৯০২ সালে। এই ছবির পরে মোঘল সাম্রাজ্য ও অন্দরমহল নিয়ে বহু ছবি আঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য—'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'কালীদাসের ঋতুসঙ্ঘার বিষয়ক চিত্রকলা', 'চতুর্ভুজা ভারতমাতা', 'কচদেবযানী', 'শেষযাত্রা'।

অবনীন্দ্রনাথের জাপানি রীতিতে আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'ওমর খৈয়াম' এক অনন্য শিল্পকর্ম। স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় তার আঁকা 'ভারতমাতা' চিত্রকর্ম ও কিংবদন্তী পর্যায়ে। স্বদেশি আন্দোলনে নতুন করে এক জাগরণ সৃষ্টি করল এই ছবি। কিংবা 'বাউল বেশে রবীন্দ্রনাথ' চিত্রকর্ম ও অনন্য এক ইতিহাস। চিত্রসাধনের শেষ পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা নতুন মাত্রা লাভ করে এবং গড়ে তোলেন কুটুম কাটুম-আকার নিষ্ঠ এক বিমূর্ত রূপসৃষ্টি।

কলকাতা আর্ট কলেজের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ এক দশক ধরা হয় বিংশ শতকের প্রথম দশককে। ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এই কলেজের কার্যনির্বাহী অধ্যক্ষ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানে তিনি ছাত্র হিসেবে পেয়েছিলেন শিল্পগুরু যামিনী রায়, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, মুকুল দে, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের।

অবনীন্দ্রনাথ কাগজ ছাড়াও কাজ করেছেন নানা মিডিয়ামে। যেমন কাপড় ও কাঠ। একইসঙ্গে বানাতেন পুতুল। সেই পুতুল নিজ হাতে কাপড় কেটে তৈরি করতেন। একটা অভ্যাস ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তা হলো প্রাতঃভ্রমণে গেলে কুড়িয়ে আনতেন সুপারিগাছের খোল, আনতেন নারিকেলের মালা, গাছের শেকড়। আর তা দিয়ে তৈরি হতো নানান ছোট আকৃতির ভাস্কর্যও।

ভারতীয় চিত্র শিল্প ও প্রাচ্য শিল্প যেন গোটা বিশ্বমহলে পৌঁছায়, তার জন্য আজীবন কাজ করেছেন তিনি। সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান ও পাশ্চাত্য শিল্পমাধ্যমের মাঝেও তিনি যেভাবে দেশীয় শিল্পকলা ও মেটাফোর নিয়ে কাজ করেছেন, তা অবর্ণনীয়। ১৯০৭ সালে তিনি ও তার দাদা গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টসে'র জন্মই বিস্মৃত এক দৃষ্টান্ত।

গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

নূরনেহার বেগম

গদ্যসাহিত্যের জন্ম আজ থেকে প্রায় দু'শো বছরেরও বেশি সময় পূর্বে। প্রয়োজনের তাগিদে জন্ম নেওয়া কথ্য গদ্য যখন লিখ্য রূপ পায় তখন তা কথ্যভাষা থেকে স্বভাবতই বহুদূরবর্তী হয়ে পড়ে। এই লিখ্য গদ্য সাধারণত ছিল সাধু ভাষায় পরবর্তীতে তা হল চলিত ভাষায়। কিন্তু এই সাধু ও চলিত ভাষা ছিল মননের ভাষা, মনের ভাষা নয়। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সাধুভাষা, উইলিয়াম কেরির কথোপথন থেকে বিবেকানন্দ-বীরবলের চলিতভাষা শুধুমাত্র মননের চাহিদাই পূরণ করেছিল। কিন্তু 'খেয়ালী মনের কথাকে ভাষাভঙ্গিতে বা লিখ্য গদ্যে' রূপ দিয়ে মানুষের মনের কাছাকাছি এনেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"।

১৩০২ বঙ্গাব্দ নাগাদ যখন 'বাল্য গ্রন্থাবলী' প্রকাশের প্রচেষ্টা চলছে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আহ্বান করেন ছোটদের উপযোগী গ্রন্থ লেখার জন্য - "অবন, তুমি লেখো না, -- যেমন করে মুখে মুখে গল্প করে শোনাও, তেমনি ক'রেই লেখো।" এই যে গুরুদায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন, তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। তবে পরবর্তীতে হয়তো কোনোরকম বাঁধা ধরাগন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি তাঁর রচনা। যাই হোক একে একে শিশুদের উপযোগী রচনা, যেমন গল্প, বিভিন্ন প্রবন্ধ, পালাসাহিত্য প্রভৃতি রচনা করতে থাকেন। জন্ম নিল 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল' (১৩০২ বঙ্গাব্দ)। এরপর একে একে 'রাজকাহিনি'র মতো কিশোর পাঠ্য, 'বুড়ো আংলা'র মতো কল্পবিজ্ঞান, 'খাতাঞ্চির খাতা' 'বাদশাহী গল্পে'র মতো উদ্ভট সব গল্প। তাঁর রচনায় মিশে ছিল একইসাথে ছবি ও সুর। হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের মতে - "রচনাকর্মকে তিনি শিল্পের পর্যায়েই নিয়ে গিয়েছিলেন"।

'শিলাদিত্য', 'পদ্মিনী', 'গোহ' সহ 'স্বর্গীয় রবিবর্মা', 'মানসচর্চা' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনার সময় তার মন যথেষ্ট দোলাচলে ছিল, 'কখনো সাধু কখনো চলিত রীতিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ভাষাসাধনা করছেন অবনীন্দ্রনাথ'। তিনি যেমন তাঁর লেখার মধ্যে ছবি মিশিয়েছেন তেমনি আবার ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে লেখার প্রসঙ্গ এনেছেন। যেমন - 'চিত্রের লেখার' কথা পাই 'চাইবুড়োর পুঁথিতে', 'চিত্র লিখিবার' কথা পাই 'স্বর্গীয় রবিবর্মা' প্রবন্ধে। এ থেকে তাঁর শিল্পীসত্তার অসাধারণত্ব যেমন প্রকাশ পায় তেমনি তাঁর শব্দ নিয়ে খেলার বিশেষত্বটি চোখে পড়ে।

তাঁর রচনার ভাষা ক্রমশ সাধু থেকে নামতে থাকলো দৈনন্দিন মুখের বুলিতে, যা তখনও ছিল প্রায় দুঃপ্রাপ্য। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিলেই ধারণা স্পষ্ট হবে তাঁর রচনার ভাষা সম্পর্কে - "দিনটা ভারি বিতিকিচ্ছিরি, ভারি উদাস! করকরে টিনের ছাত; রূপ রূপ বৃষ্টিতে চড়বড় করে খে ফুটোতে লেগেছে, রেল আসার দেরী নেই, কয়লা পোড়া ধুঁয়া জলের ভয়ে তিন বন্ধু সঙ্গ নিয়েছে ইস্ টিশানের ছাতের তলে।"

তাঁর বইয়ের ভাষা সম্পর্কে বলতে গেলে বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলতে হয় -- "সেটা তাঁর (অবনীন্দ্রনাথ) মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা; - সে তো ভাষা নয়, ছবি, সে তো ছবি নয়, গান; - সুর তাতে রূপ হ'য়ে ওঠে, আর রূপ যেন সুরের মধ্যে গ'লে যায়; - তাতে ছবির পর ছবি দেখি চোখ দিয়ে, আর কানে শুনি একটানা গান গুনগুন; ...এই জাদুকর গদ্যে যা কিছু লিখেছেন, তাতে বুদ্ধিঘটিত বস্তু কিছু নেই, তার আবেদন ভাবনার কাছে নয়, কল্পনার কাছে, আমাদের কৌতূহলের নয়, ইন্দ্রিয়ের - চেতনায়।" এ প্রসঙ্গে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য, একটি জায়গায় নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন - "অবন ঠাকুর ছবি লেখেন (বুড়ো আংলা)। আসলে কথ্যগদ্যে ছবি আর সুরের আবহ ছিল লেখকের সহজমনের আবেগ। সেখানে 'একদিকে তিনি শিশুর মতো সরল অন্যদিকে পরিপাট্যের বৈদগ্ধ্য প্রবীণ।"

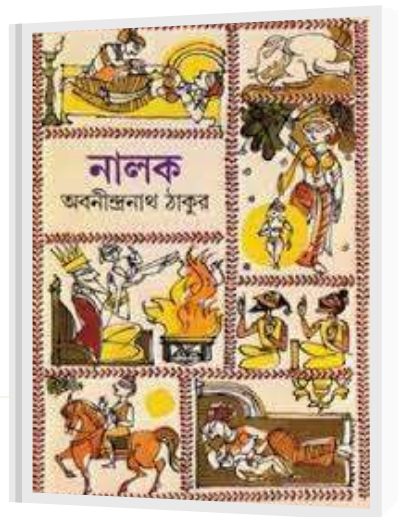
তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি শিশুর কল্পনার রাজ্য ও রোমাঞ্চ রসে জারিত।তুলির মাধ্যমে যেমন নানা চিত্র অঙ্কন করেছেন তেমনি অনায়াসে ' সীরিয়াস ' ব্যাপারের মধ্যে 'অদ্ভুত রস' মিশিয়ে নিত্যনতুন গদ্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনার ' স্ল্যাং ' কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনার স্ল্যাং এর মতো রুচিগত বিতর্কযুক্ত নয় কিংবা প্রমথ চৌধুরীর রচনার ' স্ল্যাং ' এর মতো বুদ্ধিভারে জর্জরিত নয়।তাঁর রচনার ' স্ল্যাং ' হল ' ঘরোয়া রসের নির্মল অন্তরঙ্গতা ' ।

যেমন - " গোদা চিল সারাদিন বসে ভাবত আর থেকে থেকে চিললাত - চির আঁচির ,পাঁচির , মাসির ।"

এককথায় , তাঁর রচনার ভাষা শব্দ-সুরের মায়া ,রূপকথার কল্পলোক এবং ছবির সংমিশ্রনে অনন্য হয়ে উঠেছে।এক সমালোচক তাই জানিয়েছিলেন " শিল্পীর কাজকে এইজন্য বলা হয় নির্মিত ,অর্থাৎ রসের দিক থেকে যেটি মিত হলেও অপরিমিত ।আর কারিগরের কাজকে বলা হয় নির্মাণ,অর্থাৎ নিঃশেষভাবে পরিমানের মধ্যে সেটি ধরা । "

ছেদহীন কথ্যরীতি ব্যবহার করে ভাষায় তিনি যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন ,সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই লিখেছেন " অবন যেন কথা কইছে আমি শুনতে পাচ্ছি । "

সবশেষে বলতে হয় শুধু রূপকথাধর্মিতা, চিত্রধর্মিতা,ঘরোয়া কথ্যভঙ্গি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার ভাষা বা গদ্যভাষার বহুমাত্রিকতাকে বোঝা সম্ভব নয় ।সুকুমার সেন তাই বলেছেন - " ...বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ভারতীকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্যগোষ্ঠী জন্মিয়াছিল তাহার চৈতন্যগুরু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং দীক্ষাগুরু ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ।"(অবনীন্দ্রনাথ ও আর্টের প্রভাব)



লোকসংস্কৃতির অন্তরালে 'বাংলার ব্রত'

সুশান্ত পাত্র

ভারতবর্ষ এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। যুগবিভাগের প্রথম পর্যায় থেকে একাধিক বৈদেশিক শাসক এখানে যেমন শাসন করেছে, তেমনি লুটপাটও করেছে সমান মাত্রায়। শক-হুণ-মোগল-পাঠান—এমন বহু সেনাপতি ক্ষমতার বাহুবলে মানুষকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত করেছে। পরে ব্রিটিশ রাজত্বেও সে অবস্থার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় সভ্যতার আরেক দিকের সন্ধান পাওয়া গেছে—যেখানে সমৃদ্ধির বীজ মাথাচাঁড়া দিচ্ছিল। সমসাময়িক সময়ে সেই বীজের কোনো হৃদিস না পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে সেই বীজের মহীরুহের ছত্রছায়া পণ্ডিতেরাও অস্বীকার করতে পারেননি। বিভিন্ন সময়ে আসা একাধিক মানুষের সমাগম— তা আমাদের সংস্কৃতিকে বিচিত্রতা দান করেছে। একের সংস্পর্শে অন্যের ভাষা-পোষাক, আদব-কায়দা, খাবারদাবার—ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে একটা সমঝোতার জায়গা তৈরি হয়েছে। নানা মানুষের মিশ্রণ জাতির ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এর ফলেই ভারতবর্ষে একাধিক জাতি, একাধিক ভাষা, একাধিক সংস্কৃতির এক অটুট বন্ধন পরিলক্ষিত হয়।

বৃহৎ বাংলাতেও এই সংস্কৃতির অন্যথা হয়নি। কথায় আছে—বাঙালী জাতির উদ্ভব দ্রাবিড়-অস্ট্রিক-মঙ্গোলীয় ইত্যাদি জাতির মিশ্রণে। সুতরাং আজকের বাঙালীর শোণিতে উক্ত নানা জাতির মিশ্রণ রয়েছে। আর্যরা ভারতে আসার আগে হিন্দুস্থানে যে সমস্ত আদিম অধিবাসী ছিল, আজকের সময়ে প্রকৃতপক্ষে তাদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কেননা তাদের মধ্যে আজ একাধিক জাতির বৈশিষ্ট্য এমনভাবে সোঁধিয়ে গেছে যে প্রাচীন অর্থে তাদের যে সভ্যতা, বৈশিষ্ট্য—তা আজকে আর মৌলিকতার জায়গায় নেই। অর্থাৎ এই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বাইরের আবহাওয়াকে গ্রহণ করার একটা অভাবনীয় মানসিকতা ছিল, যা সভ্য দেশের অন্য কোনো জাতি সম্পর্কে প্রায় বলাই যাবে না। যতদূর জানা গেছে— ভারতবর্ষে নেটিগ্রো, আদি-অস্তাল, ডুমধ্যসাগরীয়, মঙ্গোলয়েড ও নর্কিড ইত্যাদির মতো অনেক আদিমানব সভ্যতার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে আর্যরা এদেশে এসে তাদের সাথে যতোই দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করুক, একসময় সম্পর্কের বন্ধনে একের রক্ত অন্যের সাথে মিশে গেছে। এভাবে একটা মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

এবার প্রশ্ন, সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে! ভারতের 'সংস্কৃতি' আর 'লোকসংস্কৃতি' কথাটার মধ্যে আভ্যন্তরীণ পার্থক্য যথেষ্ট আছে। সভ্য সমাজের সংস্কৃতিকে অনেকে 'লোকসংস্কৃতি' বলতে নারাজ। কেননা, 'লোক' কথাটির সঙ্গে 'আদিম'র সম্পর্ক অনেক গভীর। যে কারণে আদিম জাতির ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কারের সঙ্গে 'লোকসংস্কৃতি' কথাটিকে সহজে উচ্চারণ করা যায়।^১ পাশ্চাত্য বিভিন্ন লোকসাহিত্য গবেষক দেশ-বিদেশের নানা লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেও ভারতবর্ষকে তারা সবসময় যেন উপেক্ষার চোখে দেখেছেন (ব্যতিক্রম জেমস্ ফ্লেজার)। একাধিক প্রাচ্য গবেষকও নিজেরদের স্বদেশভূমিকে ভুলে পাশ্চাত্য অনুকরণে কাল অতিবাহিত করেছেন। যে কারণে ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনার দেখা মেলে নি। অনেক পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে জাতির গৌরব কিয়দংশ রক্ষিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ উদ্যোগে 'বাংলার ছেলে ডুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধ সংগ্রহটি এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলে ভারতবর্ষে তথা বাঙালীদের মধ্যে এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে লোকসাহিত্যে লেখালেখি করেছেন অনেকেই। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী(ব্রতকথা), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার(উপকথা), দীনেশচন্দ্র সেন(ময়মনসিংহ গীতিকা), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর(রূপকথা) মতো একাধিক ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া অনেক খ্যাত ও অখ্যাতনামা লেখকও পরবর্তীকালে এর ওপরে লেখালেখি করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকসাহিত্যের একাধিক শাখার মধ্যে তিনি বাঙালী তথা বাংলার ব্রতকথা নিয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়েছেন।

কথায় আছে—বাঙালীর ‘বার মাসে তেরো পার্বণ’। ব্রতকথার মধ্যে দিয়ে সে কথা আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে। লোকসাহিত্যে এই ব্রতকথার উদ্ভব একেবারে আদিম যুগে। যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের কোনো বিভাজন সৃষ্টি হয়নি। বা ধর্ম জিনিসটা কি—সেটা সাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়নি—সে সময়ে ব্রত মানুষের জীবনের সঙ্গে অতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে- ব্রত “আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বকার পুরুষদের—তখনকার, যখন শাস্ত্র হননি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান, যেগুলির নাম ব্রত।”^২ অর্থাৎ ধর্ম, শাস্ত্র ইত্যাদি প্রথম দিকে মানুষের সাথে না থাকলেও, ব্রত সবসময় ছিল। সেটা কেবলমাত্র মানুষকে একত্র করার একটা উৎসব হিসেবে পরিচালিত হত। যেখানে একাধিক মানুষ নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে যৌথভাবে একটা চিত্ত বিনোদনের উপায় স্বরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। সে হিসেবে ব্রতকে বর্তমানে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করলে বোধহয় খুব একটা বেমানান হবে না। মনে রাখা প্রয়োজন, ব্রতের সাথে ব্রতীদের কামনা, বাসনা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। তবে কেবলমাত্র একজন মানুষের কামনা চরিতার্থ হওয়ার অনুষ্ঠানকে মোটেই ব্রত বলা যাবে না। একাধিক মানুষের কামনা-বাসনা একত্র হয়ে চরিতার্থের অনুষ্ঠানক্রিয়া সম্পন্ন হলে তবেই তা ব্রত বলে গণ্য হবে।^৩

বেশিরভাগ ব্রতকথায় আদিম সুর ও ছড়ার প্রভাব দেখা যায়। যেমন-

এপারে লাউল, ওপারে লাউল, কিসের বাদ্য বাজে?
ঘরে আছে রাজকন্যা তুইলা দিব বিয়া।

রাজার বেটা সওদাগর বিয়ে করতে সাজে।
সাজ সাজন্তি লাউল পায়ে নেপুর দিয়া।

সাজ সাজন্তি লাউল মাথায় মুকুট দিয়া।
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুইলা দিব বিয়া।...৪

-ব্রতকথায় এই ছড়ার প্রভাব সহজে আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত করায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা এসে আমাদের কাব্যধর্মী সাহিত্য ধারার মোড় বাহ্যিকভাবে ঘুরিয়ে দিলেও অন্তরের কাব্যপ্রিয়তাকে কখনোই ভুলিয়ে দিতে পারেনি। সে প্রভাব আজও ব্রতকথার ছড়ার মধ্যে পরিস্ফুট।

লেখক ব্রতকথাকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। এক- শাস্ত্রীয় ব্রত। দুই- মেয়েলি ব্রত। এই ‘মেয়েলি ব্রত’র আবার দুটি ভাগ। সেটা লেখকের বর্ণনার মতো বয়সের ভিত্তিতে না গিয়ে অবিবাহিত ও বিবাহিত নারীর ভিত্তিতে পৃথক করাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, লেখক তৎকালীন নারীদের বিবাহের ভিত্তিতে প্রথম পর্বে রেখেছেন ‘পাঁচ-ছয় থেকে আট-ন’ বছর বয়সের নারীদের- যারা কুমারী। আর দ্বিতীয় পর্বে উল্লেখ করেছেন ‘বড়ো মেয়েদের’, অর্থাৎ বিবাহিত নারীদের।^৫ অন্যদিকে ‘শাস্ত্রীয় ব্রত’ বলতে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যেগুলি এদেশে বিকাশলাভ করেছে, সেগুলিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন- আচমণ, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগোব্যশোধন, শাস্তিমন্ত—ইত্যাদির মতো একাধিক কার্য। এগুলি সমাধা করে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান পূর্বক কথা-শ্রবণ হল শাস্ত্রীয় ব্রতের মূল কর্মপন্থা।

তবে নারী ব্রতে শাস্ত্রীয় ব্রতের কোনো অংশ প্রবেশ করেনি—এমনটা বলা যাবে না। খাঁটি মেয়েলি ব্রত ও শাস্ত্রীয় ব্রত যুক্ত হয়ে নারী ব্রতে সহজেই প্রবেশ করেছে। সে হিসেবে শাস্ত্রীয় ব্রতের কিছু সংস্করণ অবশ্য ঘটেছে। অনেকটা বিষধর সাপ বিষ হারিয়ে সাধারণ সাপে পরিণত হওয়ার মতো অবস্থা(শাস্ত্রীয় ব্রতের)। -এর থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্টভাবে উঠে আসে। নারী ব্রতে মহিলাদের সুবিধা অনুযায়ী কামনা-বাসনার পার্থক্যে ব্রতের অনুষ্ঠানও সময়ে সময়ে বদলে গেছে। যে কারণে নারী ব্রত একাধিক প্রকৃতির ও তার প্রক্রিয়াও একাধিক রকমের হয়ে থাকে। সেজন্য তার অনুষ্ঠানও ভিন্ন ভিন্ন(সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় পরে আসছি)। সেই হিসেবে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি প্রায় একই রকমের। তার কামনা বা ব্রত যেমনই হোক না কেন, অনুষ্ঠান ক্রিয়া অনেকটা একই রকমের হয়ে থাকে। যেমন- “আমলকীদ্বাদশী ব্রত, প্রথম স্বস্তিবাচনপূর্বক ‘ওঁ সূর্যসোমঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে—ওঁ আদ্যেতানি মাঘে শুক্রে পক্ষে দ্বাদশ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী (বা শুদ্র হলে দাসী) পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি- ধনধান্যসৌভাগ্যাদি প্রাপ্যন্তে বিষ্ণুলোকগমনকামা অদ্যারভ্য... পরে সামান্যর্ঘ্য আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি সামান্যকাণ্ডের পুরো অনুষ্ঠান করে ব্রতকথা শ্রবণ—মোটামুটি সব ব্রতেরই এই প্রক্রিয়া।...সব কামনার এক ক্রিয়া, সব রোগের এক ওষুধ বা সব সিল্পুকের একই চাবি!”^৬

নারী ব্রতের যে দুটি ভাগ করেছেন তার মধ্যে প্রথম ভাগের কুমারী ব্রত সম্পর্কে এবার আলোচনা করা যাক। ব্রতের যে খাঁটি অর্থ তা অনেকটা এই কুমারী ব্রতেই দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্রতে মন্ত্রতন্ত্র ও পূজারীর কোনো জায়গাই নেই। কেবলমাত্র কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবিতে ফুল ধরলেই ব্রতের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যায়। এই ব্রতে সূর্য, উষা, কিংবা নদীকে কেমন করে স্তব করা হয় তা ছড়ার মাধ্যমে উল্লেখ করা যাক-

এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
 এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
 ভাদুলি-ঠাকুরানি ঘুচাবেন দুখ।
 এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
 কুলে সুখ।।
 সকালের কুয়াশা ভাঙার মন্ত্র
 কুয়া ভাঙুম, কুয়া ভাঙুম বেথলার আগে— সঙ্কল কুআ গেল ওই বরই গাছটির আগে।
 উষা ও সূর্যোদয়ের ছড়া
 উরু উরু দেখা যায় বড়ো বড়ো বাড়ি,
 ওই যে দেখা যায় সূর্যের মার বাড়ি!
 সূর্যের মা লো! কী কর দুয়ারে বসিয়া!
 তোমার
 সূর্য আসতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।৭

অন্যদিকে ‘পূর্ণিপুকুর’ ব্রত, বা ‘বসুধারা’ ব্রততে দেখবো আরেক কামনার প্রকাশ। বৈশাখ মাসে পুকুরের জল যাতে না শুকায়, মাছের না মৃত্যু ঘটে—সেই মনস্কামনায় পালন করা হয় পূর্ণিপুকুর ব্রত। তার ক্রিয়া হল পুকুর কেটে তার মধ্যে বেলের ডাল পোঁতা, তারপর পুকুরে জল ঢেলে পূর্ণ করা, অবশেষে বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারিধারে ফুল সাজিয়ে ছড়া বলে বেলের ডালে ফুল ধরা-

পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
 কেপুজে রে দুপুরবেলা?
 আমি সতী লীলাবতী
 ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
 হয়ে পুত্র মরবে না
 পৃথিবীতে ধরবে না।৮

বৃষ্টির কামনায় করা ‘বসুধারা’ ব্রতের কথাও এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেখানে ব্রতের আলপনা হিসেবে আট তারা আঁকতে হয়, একটি মাটির হাঁড়ি ফুটো করে বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালতে হয়। যার মধ্যে দিয়ে কামনা জানায়-

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি
 তিন কুল ভরে দাঁও ধরে জনে সুখী।৯

-এভাবে কুমারী ব্রত বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে তার ক্রিয়া সাধন করে। তবে ধর্মের প্রাদুর্ভাবে লৌকিক ব্রতের চেহারা আগের তুলনায় অনেকখানি বদলে গেছে। বর্তমানে সেসবের যে খাঁটি চেহারা পাওয়া যায়, তা অতি অল্প। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই ব্রত বিভিন্ন পাড়া বা গ্রাম বিশেষে কিছু কিছু বদলে গেছে। সেসবের মাঝখান থেকে ব্রতের আসল চেহারা খুঁজে বার করা বেশ গবেষণালব্ধ কাজ।

এবার আসি নারী ব্রতের অন্য পর্ব অর্থাৎ, বিবাহিত নারীদের ব্রতকথা আলোচনায়। এই পর্বে অন্যান্য পর্বের থেকে আড়ম্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যাধিক বেশি। তাই বেশিরভাগ ব্রতকথায় আলপনা যেন অতি সাধারণ উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলপনা ছাড়াও অন্যান্য উপকরণেরও বাহুল্যতা চোখে পড়ে। তবে ব্রতকথার ছড়ায় উচ্চারিত বাক্যের তেমন কোনো আধিক্যতা দেখা যায় না। যতটুকু কামনা ঠিক ততটুকুই তারা উচ্চারণ করে। যেমন-

আমরা পূজা করি পিঠালির চিরুনি,
 যেন সোনার কুটুই।
 আমরাগো হয় যেন সোনার চিরুনি।
 আমরা পূজা করি পিঠালির পালকি,
 আমরা পূজা করি পিঠালির কুটুই,
 আমরাগো হয় যেন সোনার পালকি। ১০

সধবা নারীদের একটি প্রচলিত ব্রত হল ‘ভাদুলি’। বর্ষার পরে আত্মীয়স্বজনের(স্বামী-শ্বশুরের) বিদেশ-বিড়ুই থেকে অক্ষত দেহে ফিরে আসার কামনা করে এই ব্রত করা হয়। ব্রতের উপকরণ হল- ভাদুলির মূর্তি, জোড়াছত্র মাথা, জোড়ানৌকার ছবি, এসব ঐকে তার চারদিকে সমুদ্র, কাঁটাবন, হিংস্র জন্তু, নৌকা -ইত্যাদির আলপনা ঐকে তারপর ব্রত করা হয়। ছড়াতে ব্রতের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট-

নদী, নদী! কোথা যাও? বাপ-ভায়ের বার্তা দাও! ১১

এছাড়াও সধবাদের ‘রা’ল দুর্গার’ ব্রত, ‘লক্ষ্মী ব্রত(হরিতা লক্ষ্মী, স্বর্ণ লক্ষ্মী, অরুণা লক্ষ্মী), মাঘমণ্ডল ব্রত -ইত্যাদির মতো একাধিক ব্রতের সন্ধান পাওয়া গেছে। সমস্ত ব্রতেই আলপনা ও ফুলের প্রাধান্য দেখা গেছে। এখানে ফুলের ব্যবহার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য পাদ্য অর্ঘ্য অর্পণের উদ্দেশ্যে নয়, তা অনেকটা যেন হিসেব রক্ষার জন্য। একেকটিতে ফুল দিয়ে কামনা করা শেষ—যেন এটা বোঝানো হয়। অনেকটা উপাস্যকে সাক্ষী রাখা যে-দেখ ব্রতী তার কামনা জানিয়েছে। এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে নিম্নোক্ত ছড়া উচ্চারণে-

ফুলের পাশাপাশি আলপনার কথায় আসলে দেখা যায় সমস্ত ব্রততে আলপনা যেন কামনা প্রকাশ করবার একটি মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ব্রতর কামনা অনুযায়ী স্বল্প আলপনায় ব্রতর কাজ সহজে সমাপ্ত হতে পারত। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য পিপাসী মন সেই সৌন্দর্যের যথার্থতা প্রকাশে শিল্পীর তুলি দিয়ে তাকে সর্বাপেক্ষ সুন্দর করে তুলতে চাইল। এভাবে দিনে দিনে সমস্ত কিছুতেই আলপনা মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে, 'রা'ল দুর্গার' ব্রত কিংবা 'মাঘমণ্ডল' ব্রততে ছড়ার আদলে অনেকটা নাট্যগুণের আভাস পাওয়া গেছে। সেখানে ব্রতর সমস্ত ক্রিয়াকলাপটাই যেন নাটকের মতো করে পরিবেশন করা হয়েছে।

পাশাপাশি কিছু মনগড়া ব্রতেরও সৃষ্টি সম্পর্কেও আলোচনা করা যাক। যেমন 'আদরসিংহাসন' ব্রত। স্ত্রীরা যাতে সারাবছর স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ির আদর-যত্নে থাকে -এই কামনায় 'আদরসিংহাসন' ব্রত শুরু হয়েছে। মনগড়া ব্রতের মধ্যে আরো উদাহরণ হল- 'অক্ষয়তৃতীয়া', 'অঘোরচতুর্দশী', 'ভূতচতুর্দশী', 'নৃসিংহচতুর্দশী', -ইত্যাদি। এসব ব্রত 'তিথি মাহাত্ম্য' প্রচারের জন্য বিশেষ করে প্রচলিত হয়েছে। এদের দেখাদেখি ব্রাহ্মণরাও কিছু মনগড়া ব্রতর প্রচলন করেছেন। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'দধিসংক্রান্তি', 'কলাছড়া', 'গুপ্তধন', 'ঘৃতসংক্রান্তি', 'দাড়িম্বসংক্রান্তি' -ইত্যাদি।

এভাবে কামনা ও প্রয়োজনের খাতিরে ব্রত নানা পথে চালিত হয়েছে। তবে আশার কথা যে, প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের সভ্যতার সাথে সাথে ব্রতর নানা রূপ বদল হয়েছে বলে তা নিচক নিরস হয়ে পড়েনি। যদি তার কোনো বাঁধাধরা বৃত্ত থাকত, তাহলে ব্রত বলতে আজকে আমাদের যে উৎসাহ, যে আবেগ—তা হয়তো অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ত। ব্রতর যেটা মুখ্য দিক হল কামনা। যে কামনা করে ব্রতর ক্রিয়া সমাপন করা হয়, সেই কামনার প্রত্যাশিত ফল সাধারণত অনেক সুদূর প্রসারী। আর প্রতিটা ব্রতীও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। অর্থাৎ তাদের প্রত্যাশা ও প্রত্যাশিত ফলের মধ্যে একটা বিস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে। যার ফলে ব্রতর আয়োজন ব্রতীর শিল্পীনিপুণতায় যথার্থ শিল্পে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'বাংলার ব্রত'কে যথার্থ শিল্পে উত্তীর্ণ করেছেন। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র মতো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থটিও সমান জনপ্রিয়তার আসনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

টীকা ও তথ্যসূত্রঃ

১। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'সংস্কৃতি' ও 'লোকসংস্কৃতি' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'সংস্কৃতিকে' সভ্য সমাজের সঙ্গে আর 'লোকসংস্কৃতিকে' আদিম সমাজের অঙ্গীভূত বলে উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন- আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', দ্বিতীয় প্রকাশ-শ্রাবণ ১৩৯২, পুস্তক বিপণি, পৃ.- ১১।

২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলার ব্রত', অগ্রহায়ণ ১৪২২, বিশ্বভারতী, পৃ.- ৩৯।

৩। এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন- দ্রঃ- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলার ব্রত', অগ্রহায়ণ ১৪২২, বিশ্বভারতী, পৃ.- ৩৯।

৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলার ব্রত', অগ্রহায়ণ ১৪২২, বিশ্বভারতী, পৃ.- ৩৯।

৫। তৎকালীন সময়ে নারীদের নয়-দশ বছর বয়সে বিবাহ হওয়ার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই অবস্থান থেকেই তিনি বয়সের নির্ধারণ অনুযায়ী ব্রতকথায় নারীদের পৃথক করেছেন। আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন- দ্রঃ- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলার ব্রত', তদেব, পৃ.- ৫।

৬। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলার ব্রত', তদেব, পৃ.- ১০।

৭। তদেব, পৃ.- ৭।

৮। তদেব, পৃ.- ১০।

৯। তদেব, পৃ.- ১১।

১০। তদেব, পৃ.- ৪০।

১১। তদেব, পৃ.- ১৪।

১২। তদেব, পৃ.- ১৫।

চিত্র শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

মোক্ষি সাহা

ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্র শিল্পের জনক এবং ছবি যার মূল উপজীব্য তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বিখ্যাত অংকন শিল্পী, নন্দনতাত্ত্বিক ও লেখক এর জন্ম ১৮৭১ এর ৭ অগাষ্ট ;জন্মাষ্টমীর দিন, বেলা ১২ টা ১১ মিনিটে।তার কাছে শিল্প হচ্ছে শখ। আর এই শিল্প বর্তমানে ভারতবর্ষের চিত্রকলার আত্ম উপলব্ধি গ্রহণ করছে।

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষকতা নিয়েও অনেক কাহিনী বিদ্যমান। তার অন্যতম প্রিয় এক ছাত্র নন্দলাল বসু উমা র তপস্যা নামক একটি ছবি এঁকে তাকে দেখালে তিনি তখন তার ছাত্রকে জিজ্ঞাস্য সূত্রে বললেন "এত রং কম কেন? আর কিছু না করো উমা কে একটু চন্দন ফুল টুল দিয়ে সাজিয়ে দাও।"ছবি নিয়ে নন্দন ফিরে যাবার পর অবনীীর সারারাত ঘুম হলো না এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন কেন তিনি নন্দলাল কে এমনটা বললেন। পরক্ষণই তার মাথায় আসলো সে হয়তো এমন ভাবে উমাকে দেখেননি। তপস্যারত উমা কেনইবা ফুল চন্দনে সাজবে? পরদিন ভোর হতেই তিনি ছুটলেন ছাত্রের বাড়ি এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন নন্দলাল ছবিটি বদলানোর জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। সেটি দেখে তিনি আচমকাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন "তোমার উমা ঠিকই আছে। আরেকটু হলেই ভালো ছবিখানা নষ্ট করে দিয়েছিলুম আর কি।" শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন এমনটাই। তিনি প্রত্যেক মানুষের দিক থেকে তাদের চিত্রটি কে তাদের মতন করে ভাবার চেষ্টা করতেন।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার পাঠ শুরু হয় তৎকালীন আর্ট স্কুলের শিক্ষক ইতালীয় শিল্পী গিলার্ডিঁর কাছে। পরবর্তীতে ইংরেজ শিল্পী সি এল পামারের কাছে লাইফ স্টাডি, তেলরং ইত্যাদি শিক্ষা অর্জন করেন। ভারতীয় রীতিতে তাঁর আঁকা প্রথম চিত্রাবলি 'কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত'।

এই রীতি অনুসারী চিত্রশিল্পের তিনি নব জন্মদাতা। তার উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মগুলো হলো=ওমর খৈয়াম (জাপানী রীতিতে আঁকা),শাহাজাদপুরের দৃশ্যাবলী,আরব্যপোন্যাসের গল্প,বসন্তের হিমালয়,কবিকঙ্কন চন্দী,প্রত্যাবর্তন, শেষযাত্রা,সাজাহান,কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চিত্রাবলী,বজ্রমুকুট,ঋতুসংহার,বুদ্ধ,সুজাতা।

ভারতের চিত্রকলার আধুনিকতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান অবদান এটাই, তিনি ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিক আগ্রাসন থেকে উদ্ধার করে নিজস্ব ঐতিহ্যের শিকড়ে যুক্ত করে আধুনিকতা উন্নীলনের স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করেছিলেন। নন্দলাল বসু সহ তাঁর অন্যান্য শিষ্য পরস্পরার গবেষণার মধ্য দিয়ে সেই পথই প্রসারিত হয়ে গড়ে তুলেছিল এক স্বতন্ত্র ঘরানা, যা আজ নব্য-ভারতীয় ঘরানা নামে সুপ্রতিষ্ঠিত।

শিল্পী জীবনের শেষ পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প চিন্তার হয় নতুন এক যাত্রা। ডুবে যান তিনি পরিত্যক্ত জিনিসপত্রে "কুটুম কাটাম" শিল্পরূপ তৈরি করতে।

"রচনা যেখানে রচয়িতায় স্মৃতি ও কল্পনার কাছে ঋণী সেইখানেই সে আর্ট।"- এই উক্তিটি সাহায্যে তিনি বারংবার বুঝিয়ে দিতে চান তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করা সত্ত্বেও আমাদের মনের মণিকোঠায় আজীবন অমর হয়ে থাকবেন।



রেখায় রেখায়

আয়ুধ



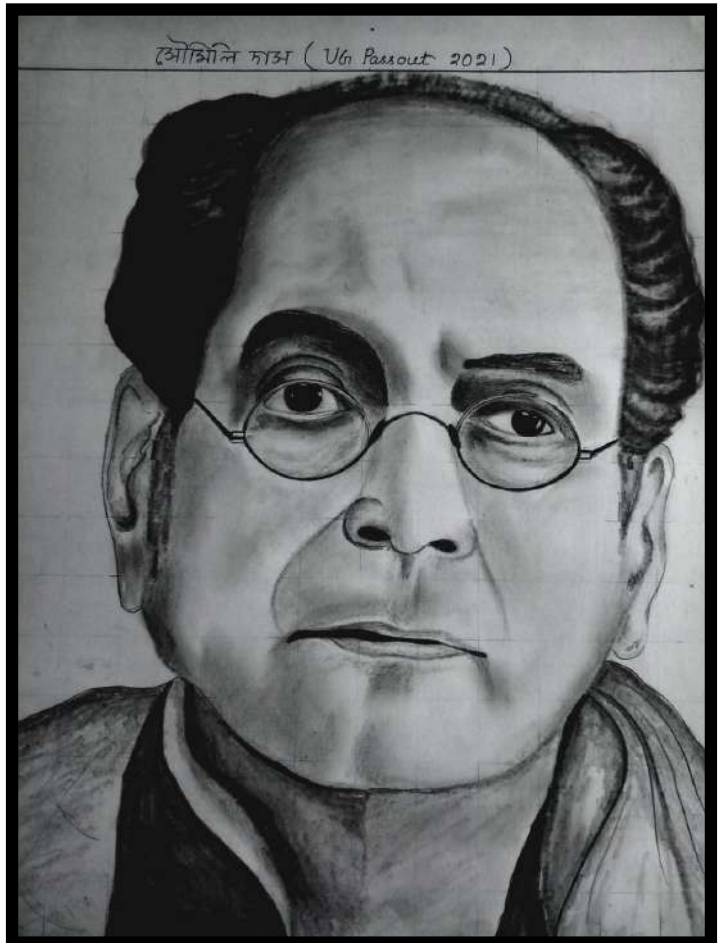
অন্যোন্ন পত্রিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়



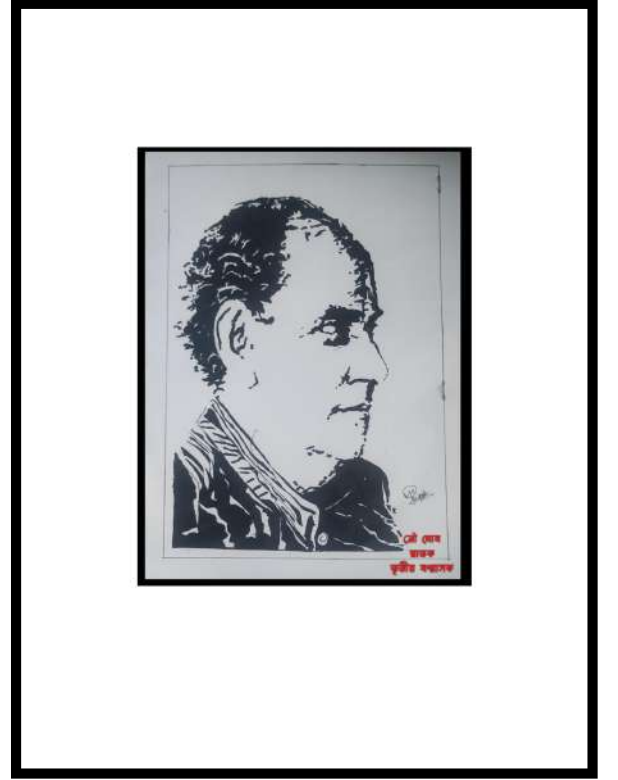
SUSMITA DAS. UG_5th SEM, ROLL : 1901031

শিল্পী
সুমিত্রা দাস



শিল্পী
সৌমিলি দাস

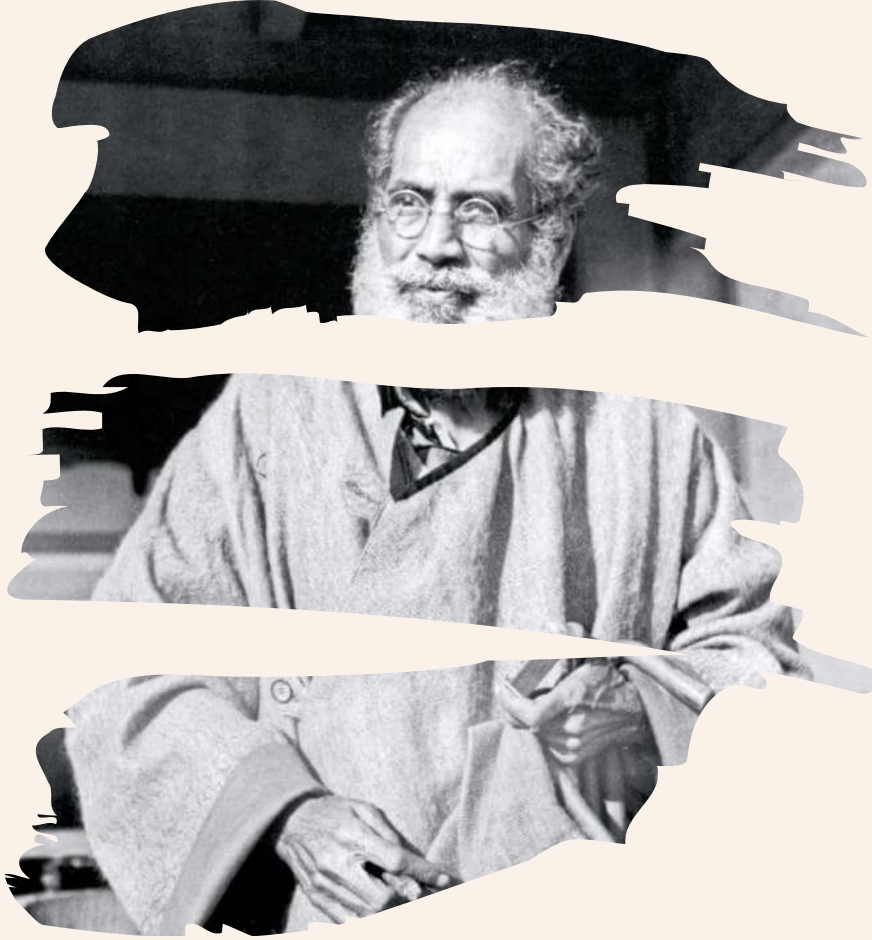
শিল্পী
মোঁ ঘোষ



শিল্পী
মণিদীপা কর্মকার

ফিরে পড়া

আয়ুধ



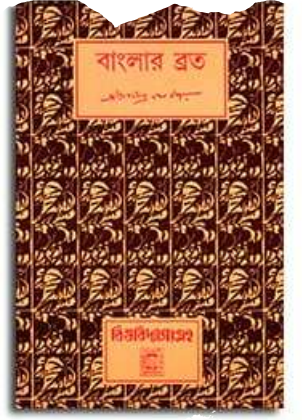
তখনোইন পত্রিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

বাংলার ব্রত

সমগ্র ভৌমিক

এক কাজে এক উদ্দেশ্যে যখন দশে মিলে নিজেদের কামনা চরিতার্থ করার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে ব্রত বলে। একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত চলে না। ফলে ব্রততে একাধিক মানুষের একই উদ্দেশ্যে থাকা প্রয়োজনীয়। রবি ঠাকুর অনেক বছর আগে থেকেই বাংলার ছেলে ভোলানো ছড়া ও মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং অবন ঠাকুর রবী ঠাকুরের কাজ থেকে প্রেরণা পেয়ে লিখে ফেললেন 'বাংলার ব্রত' বইটি।



১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল অবন ঠাকুর এর বিখ্যাত বই 'বাংলার ব্রত'। সমগ্র ভারত তথা সমগ্র বাংলা জুড়ে সনাতনী সংস্কৃতির এক অবক্ষয় বাড়ছিল; বাড়ছিল ধর্মীয় প্রভাব, তখন প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছিল বাংলার ব্রতকথা, তার নানান চিত্র-রসদ ইত্যাদি। এই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রিক পথকে অনুসরণ করে অবক্ষয় রুখতে অগ্রসর হলেন অবন ঠাকুর। এটা অনেক বড়ো সাংস্কৃতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বাংলার নানাস্থান থেকে বাংলা ব্রতের আলপনা, নকশা তথা মেয়েলি ব্রত, স্বদেশানুরাগ ও সনাতনী সংস্কৃতি সংগ্রহ করে এই বইটি প্রকাশ হলো।

অবন ঠাকুর বাংলার ব্রত কে তিন ভাগে ভাগ করেছে যথা

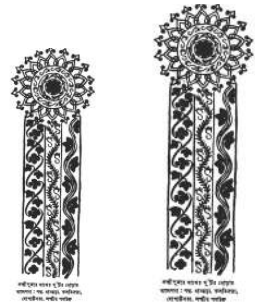
- 'শাস্ত্রীয় ব্রত' - প্রথমে সামান্যকাল্ড যেমন আচমন, স্বস্তবচন, কর্মারম্ভ ইত্যাদি পরে ব্রততে রুচি জন্মানোর জন্য ব্রতকথা শোনা। যদিও সামান্যকাল্ড ও ব্রতকথা দুটোই পৌরানিক ব্রতের উপাদান।
- 'নারী ব্রত'- খাঁটি মেয়েলি ব্রত ও শাস্ত্রীয় ব্রতের মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয়েছে নারী ব্রত। যদিও বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা চলে গিয়ে লৌকিক ব্রতের সরলতা নষ্ট হয়ে এবং ব্রাহ্মণ ও তন্ত্রমন্ত্র বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।
- 'কুমারী ব্রত' - খুব সহজ সরল ভাবে এই ব্রত পালন করা হয় তাতে ব্রাহ্মণ বা তন্ত্রমন্ত্রের চাকচিক্য থাকে না বরং এগুলো অনেক খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন আলপনা দেওয়া পুকুর কাটা নিজেরাই ব্রতকথা পাঠ করা এবং ফুল ধরে শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ করা। বাংলার নানাস্থান থেকে বাংলা ব্রতের আলপনা, নকশা তথা মেয়েলি ব্রত, স্বদেশানুরাগ ও সনাতনী সংস্কৃতি সংগ্রহ করে এই বইটি প্রকাশ হলো।

পৌরানিক ব্রত শাস্ত্রীয় ব্রতের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে যেমন সাধারণ লোকের সঙ্গে এই ব্রত গুলির যোগসূত্র খুবই কম সেখানে সর্বদা প্রাধান্য পায় তন্ত্রমন্ত্র ও পূজারী ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় ব্রতের ছাঁচ টা ব্রতের মতো হলেও এটি জোড়াতাড়া দেওয়া কৃত্রিম পদার্থ। নতুন নতুন ব্রত, নিজেদের মনগড়া, তাও সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। যেমন অক্ষয়তৃতীয়া অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী নৃসিংহচতুর্দশী, এমন কতকগুলি ব্রত তিথিমাহাত্ম প্রচারের জন্য। এগুলি কেবল নৈবেদ্য ও দক্ষিণার লোভ থেকে পূজারিরা সৃষ্টি করেছে। কলাছাড়ায় ব্রাহ্মণকে কলা দান, সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন, ঘৃত দাড়িম্ব এইসব জিনিস বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দিলে ভালো হয়-এই ব্রতগুলির মূলকথাটা এ ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে আবার খাঁটি নারী ব্রত গুলিতে তার ছড়াতে আলপনা য় জাতির মনের তথা চিন্তার ছাপ থাকে, এতে বাহ্যিক চাকচিক্য পরোক্ষ, প্রত্যক্ষভাবে থাকে আভ্যন্তরীণ ছাপ। খাঁটি মেয়েলি ব্রততে সূর্যকে উষাকে এবং নদনদীকে ছড়ার মধ্যে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। নদী থেকে জল তোলবার মন্ত্র বা ছড়া



স্বদেশীয় ঈশ

"এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
ভাদুলি-ঠাকুরানি ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী একখানে মুখ
দিবেন ভাদুলি তিনকূলে সুখ।।
সমুদ্রে ফুল-ধরবার মন্ত্র বা ছড়া
সাত সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন সমুদ্রে চেউ তুলে?" ...



এই প্রসঙ্গে আর্ঘ্য-অনার্ঘ্য মতবাদ সাধারণত আমাদের পণ্ডিতমহলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত :

"আর্ঘ্য এবং আর্ঘ্যপূর্ব দু'জনেরই সম্পর্ক যে-পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দু'জনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস; দু'জনে ব্রত করছে যা কামনা করে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন—ইন্দ্র আমাদের সহান হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শক্ররা দূরে পলায়ন করুক, ইত্যাদি; আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে—'রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতি হব'। এর সঙ্গে পৃথিবী-ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম-মন্ত্রটি দেখি—

বসুমাতা দেবী গো! করি নমস্কার ।
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার ।

এছাড়া কুমারী ব্রত যে একেবারে খাঁটি ব্রত এমন নয়। সেখানে কামনা যতোরকম তার চরিতার্থ প্রক্রিয়া ও ততোরকম। যেমন -"বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে, এই কামনা করে পূর্ণিপুকুর; সেখানে ক্রিয়া হচ্ছে পুকুর কাটা, তাঁর মধ্যে বেলের ডাল পোঁতা, পুকুরে জল ঢেলে পূর্ণ করা, তারপর বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারি ধারে ফুল সাজানো এবং ছড়া বলে বেলের ডালে ফুলে

'পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরেব না'
পৃথিবীতে ধরবে না ইত্যাদি ।



আবার যখন বৃষ্টির কামনা ক'রে বাসুধারা ব্রত তখন আলপনায় আটা তাঁরা আঁকতে হচ্ছে, একটি মাটির ঘটে ফুটো ক'রে বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে; এমনি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ কামনা জানাচ্ছে-

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি
তিন কুলে ভরে দাও ধনে জনে সুখী ।

অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, ব্রতের সঙ্গে বেদের সাদৃশ্য সত্ত্বেও একটি মৌলিক অমিল রয়েছে : বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের। বামাচার-প্রসঙ্গেও আমরা এই রকমই একটি প্রভেদ লক্ষ্য করেছি : বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের স্মারকগুলি পুরুষপ্রধান, লোকায়তিক বামাচার স্ত্রীপ্রধান। আর-কতকগুলি ব্রত; যার নামটা রয়েছে পুরোনো কিন্তু ভিতরের মালমশলা সমস্তই নতুন-যেমন কুঙ্কটীব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তুবিকই ছোটোনাগপুরের পার্বত্যজাতির এ ব্রতটি; কুঙ্কটী হলেন তাদের দেবী।লোকসংস্কৃতির হয়ে ইউরোপীয় স্বদেশভাবনার পথ দেখায় ফিনল্যান্ড ,আমেরিকার হুইচল জাতি; পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন-কেবল ভিন্ন ভিন্ননামে দেখি ,যেমন বেদের 'সূর্য' ইজিপ্তে 'রা' অথবা 'রাআ', মেক্সিকোতে 'রায়মী' বাংলায় 'রায়' বা 'রাঈ'। বেদের অনেক দেবতাকেই আমরা অন্যব্রতদের মধ্যে আমরা খুঁজে পাব। একদিকে বাংলা জুড়েই ছিল তার সীমাহীন প্রকাশ। বাংলার মায়েরা, মেয়েরা এ ভাবেই দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। হিন্দু সনাতনী গৃহবধুর নিজের মনে জন্মানো মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে যে সীমাহীন সৌন্দর্য রয়েছে, তার সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন রবী ঠাকুর আর তাঁরই পথ অবলম্বন করে দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষনে যিনি ব্রতী হয়েছিলেন তিনি হলেন অবন ঠাকুর । দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষনে তাঁর পূর্বে ও পরবর্তীতে অনেকেই হয়তো এ কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তবে রবি ঠাকুরের পরবর্তী স্থান যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই তা আর বলার অবকাশ রাখে না ।

ক্ষীরের পুতুল

অভি দাস



কাহিনির প্রথমেই দুই রানির কথা বলা হয়েছে। একজন বড়ো রানি অর্থাৎ দুয়োরানি আর একজন ছোটোরানি অর্থাৎ সুয়োরানি। দুয়োরানি অর্থাৎ দুঃখের প্রতীক। সুয়ো অর্থাৎ সুখের প্রতীক তাহলে প্রশ্ন হল এই রাজা দুই রানির মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসতেন? কাকে পছন্দ করতেন? কার সঙ্গে থাকতেন?

এই প্রশ্নগুলো পাঠকবৃন্দের মধ্যে আসবেই এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সব উত্তর মিলবে একে একে। প্রথমে আমরা দেখব একটা বিষয় যে রাজা ছোটরানিকে সকল সুখের সম্রাজ্ঞি করতে চান। আর বড়োরানিকে এই

সকল দুঃখের। সুয়োরানী সকল ভোগ আকাঙ্ক্ষা লাভ করে। আর দুয়োরানি সব কিছু থেকে বঞ্চিত। তাহলে রাজার বেশি ভালোবাসা হোক আর ভরসা যায় ছিল না কেন সবটাই ছোটরানি অর্থাৎ সুয়োরানির প্রতি। সুয়োরানী বড্ড আদরের তার। আর বড় রানী চক্ষুশূল। ছোট রানী থাকেন সোনার পালঙ্কে। আমরা এখানে দুই রানী আর কাহিনীর মধ্যে কি পেলাম সেটাই দেখব। সঙ্গে দেখব নামকরণ। বেশি কিছু বলার সাহস বা ক্ষমতা কিছুই নেই অবন ঠাকুরের লেখা ক্ষীরের পুতুল সম্পর্কে আলোচনা করার।

ক্ষীরের পুতুল গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ। রূপকথার চঙে লেখা। কিছু লোককথার সঙ্গে নিজের ভাবনার মেলবন্ধন ঘটালেন। কাহিনি মধ্যে আমরা পেলাম দুই রানীকে। সুয়োরানী সর্ব সুখ পায়। আর দুয়োরানী সকল কিছু থেকে বঞ্চিত। সুয়োরানীর ঘরে রাজা সব সময় থাকেন। দুয়োরানীর ঘরে থাকেন না। তাহলে আমার প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক রাজা কেন রানিকে বিবাহ করেছিলেন? এটা কি তৎকালীন প্রথা না অন্য কিছু....। রাজা যখন দেশে বিদেশে ভ্রমণ করতে গেলেন তখন ছোট রানির কাছ থেকে শুনলেন যে তার জন্য কি কি আনতে হবে। বড় রানীর কাছ থেকে শুনে যাবে এই কথাটা তার মাথায় থাকলো না তার বোধহয় মতিভ্রম ঘটেছিল। ছোট রানী তার পছন্দের সকল জিনিসের কথা রাজাকে বললেন দুয়োরানী বললেন তার জন্য এটা মুখপোড়া বানর আনতে। রাজা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে ছোটরানীর পছন্দের জিনিস সংগ্রহ করলেন। কিন্তু বড়োরানির জন্য বাদরটি কেনার কথা ভুলে গেলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত একটি বাঁদর জোগাড় করে নিয়েও আসলেন। তাহলে এখানে প্রশ্ন হল রাজা কেন বড় রানীকে বারংবার পিছনে ঠেলে দিচ্ছেন? কিন্তু লেখক এখানে দেখালেন রাজা যখন চলে যাচ্ছেন ছোটরানীর যতটানা উদ্বিগ্ন বড় রানী তার থেকে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন। সে পথ পানে চেয়ে বসে আছে কখন রাজা আসবেন। তাহলে স্পষ্ট হলো ছোট রানী সৌন্দর্য রাজকীয় চাওয়া পাওয়ায় উন্মত্ত কিন্তু বড়োরানি ভালোবাসায় উন্মত্ত। লেখক বড়োরানির মধ্যে যে প্রেমানুভূতি দেখালেন সেই প্রেমের অনুভূতি বুঝলেন না রাজা। বা আদৌ কি রাজা বুঝবেন? নাকি সে ছোট রানী তাই মত্ত থাকবেন। বড় রানী দুঃখের অবসান কি আদৌ হবে নাকি সে চিরকাল পিছনেই থেকে যাবে.. ছোটরানীর জন্য রাজা যে সকল জিনিস নিয়ে এসেছিল তা ছোটরানীর পছন্দ হলো না। বড়োরানির রাজার প্রতি তীব্র ভালোবাসা ছিল। তা বড়ো রানির অর্থাৎ দুয়োরানির কথায় স্পষ্ট-

হায় মহারাজ কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে আমি
এমনই অভাগিনী তোমার জন্য হেঁড়া কাঁথা পেতে
দিলুম ।

রানির কথায় রাজার চোখে জল চলে এল। রাজা ছোটো রানি ও বড়ো রানির তফাৎ করতে বুঝলেন। এবং তখন বললেন রানি আমি তোমায় আর দুঃখ দেব না। আমি যে তোমার ঘরে আসি এই কথাটি তুমি ছোটো রানিকে জানিও না তাহলে প্রশ্ন হলো রাজা কি ছোটো রানিকে ভয় পেতেন? এই টুকু বলে বাঁদর কে বড়ো রানির কোলে দিয়ে রাজা ঘর থেকে বেড়িয়ে আসলেন। বড়ো রানি সেই বাঁদরকে কোলে নিয়েই তার দিন অতিবাহিত করত। বড়ো রানির দুঃখ ছিল যে সে রানি হয়েও রাজকীয় সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারলো না। এভাবে দিনের পর দিন গুমড়ে গুমড়ে কাঁদছিল। রাজবাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে রানি কাঁদতে থাকতো। বাঁদর নানা প্রশ্ন করে রানিকে উত্তর পায়নি সেভাবে।

বাঁদর প্রতিশ্রুতি দেয় যে রানির সকল সুখ সমৃদ্ধি ফিরিয়ে দেবে। খুব কষ্টে বড়ো রানিকে থাকতে হতো। রোদ- বৃষ্টিতে ভাসা ঘরে থাকতে হতো তাকে। লেখক বড়ো রানির যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা ভাবতে গেলে শিহরণ হয়। বানর বুদ্ধি করে রাজার কাছে গিয়ে বললেন রানি মা হতে চলেছেন। এও বললেন যে তার ছেলে হবে। রাজা সেই শুনে খুব খুশি হলেন এবং গজমতির হার উপহার দিলেন। এখানে লেখক দেখালেন সন্তান হওয়ার কথা শুনে রাজা খুব খুশি অর্থাৎ এখানে বংশ রক্ষার প্রস্ন এসে যায়। বাঁদর হারটি নিয়ে যখন রাজার কাছে গেলেন তখন রানি তাকে একাধিক প্রস্ন করলেন। রানির মনে প্রস্ন জাগে বাঁদর হারটি চুরি করে এনেছে কিনা। এই ভাবে বুদ্ধি করে বাঁদর উত্তর দিলো যে মা আমি স্বপ্নে পেয়েছি আমার ভাই হয়েছে। সেই স্বপ্নবশত রাজার কাছে গিয়ে আমি বললাম যে মায়ের খোকা হবে। লেখক এখানে আঁকলেন এক মনোরম চিত্র বড়ো রানির সন্তান হবে শুনে ছোটো রানির হিংসে। ঠিক এই সময় থেকে রাজার সঙ্গে ছোটো রানির বিবাদ শুরু হলো। রাজা ছোটো রানিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজা বড়োই বুদ্ধিমান সে সব কিছু শুনেও বড়ো রানির ঘরে গেলেন না। কারণ যদি এই সব দেখে ছোটো রানি যদি বড়ো রানিকে হত্যা করে..। এখানে বাঁদরের এক চতুরতা লেখক দেখালেন। অর্থাৎ বড়ো রানিকে বাঁদর কিভাবে অন্দমহলে নিয়ে যাবেন এই পন্থা অবলম্বন একে একে কার্যসিদ্ধি করতে লাগলো। অর্থাৎ সন্তানের প্রতি রাজার তীব্র আকর্ষণ লেখক দেখালেন। দুয়োরানি ভাসা ঘর থেকে রাজমহলে আসলেন। সিদ্ধ ভাত খাওয়া থেকে পঞ্চ ব্যঞ্জন আহারে বসলেন বানরের বুদ্ধিতে। বড়ো রানি নতুন রূপে সাজলেন আর ছোটো রানি হিংসেই জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণি পরামর্শে ছোটো রানি বড়ো রানিকে হত্যা করতে উন্মত্ত হলেন। বুড়ি ব্রাহ্মণী যত্ন করে বিষ মিশিয়ে দিলেন বড়ো রানির খাবারের মধ্যে। লেখক উল্লেখ করলেন- রানি ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙ্গে খেলেন জিভের স্বাদ গেল, মুগের নাড়ু মুখে দিলেন গলা কাঠ হয়ে গেল, মতিচুর মিঠাই খেলেন বুক যেন জ্বলে গেল। ছোটো রানি বড়ো রানিকে হত্যা করার পন্থা অবলম্বন করলেন একের পর এক। এখানে লেখক দেখালেন বানরের মানব সত্তা। অর্থাৎ বানর এখানে বড়ো রানীর সঙ্গে সব সময় ছায়ার মতন আছে। এই চিত্র অঙ্কন করে লেখক কাহিনি মধ্যে এক অবিষ্মরণীয় উদ্যমতা সৃষ্টি করলেন।

বানর যখন খবর দিলো বড়ো রানি মা হতে হয়েছেন, রাজা আনন্দিত হয়ে বানরকে বললেনরানি আর তার ছেলেকে দেখতে যাবেন। তখন বানর বলল যে ছেলের মুখ দেখলে রাজার চোখ অন্ধ হবে। যখন ছেলের বিয়ে হবে তখন মুখ দেখো। রাজ নগরে আনন্দের বাজনা বেজে ওঠে। ইতিমধ্যে ছেলে বড়ো হয়ে যাওয়ায় ছেলের বিয়ে আসন্ন। রাজা খুবই উদ্ভিগ্ন। পাত্র পাত্রীও ঠিক। ছেলে নিয়ে রানি খুব চিন্তিত। কারণ রাজা বলে দিয়েছেন ছেলেকে না দেখতে পেলে অনর্থ করবেন। রানি তো উদ্ভিগ্ন। এখানেও বাঁদরের ওপর মানব সত্তা প্রয়োগ করা হলো। এর পরেই লেখক এখানে আনলেন ষষ্ঠী ঠাকুরের প্রসঙ্গ। ষষ্ঠী ঠাকুর হলেন শিশুদের দেবতা। এই প্রসঙ্গ এনে কাহিনির মাধুর্যতা আরো বৃদ্ধি করলেন। এর মধ্যে আমরা ষষ্ঠী ঠাকুরের অনেক কলাকুশলী দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় প্রতিটি কলাকুশলী যেন বানরের সৃষ্টি করা। অর্থাৎ বানর যেন এখানে প্রধান চরিত্র। বানর ইচ্ছা করে একটি ক্ষীরের পুতুল তৈরী করে রাখেন। মা ষষ্ঠী খিদের তারনাই ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে ফেলেন। ঠিক তখনি বুদ্ধি করে ক্ষীরের পুতুলটির পরিবর্তে একটি মানুষ (পুতুল) মা ষষ্ঠীর থেকে নিয়ে নিলেন। অর্থাৎ বাঁদরের বুদ্ধিতে নানা ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হলো। একদিকে দুয়োরানির কোলে সন্তান ফিরলো কিন্তু এখানে বাঁদরের বুদ্ধির বাহবা দিতেই হয়। বানর না থাকলে কিছুই হতো না। রাজা খুশি হলেন ছোটো রানির ছলচাতুরি ধরা পড়লো। বড়ো রানি সুয়োরানিতে পরিণত হলেন এবং সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করতে লাগলেন। এখানে আমি পাঠ অনুভূতি উজাড় করলাম। সহজ থেকে সহজতর ভাষায় একটু আলোচনা করলাম। এখানে যে সব ট্যাঁবু ব্যবহার করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গ এনে ভাষার জটিলতা বৃদ্ধি করলাম না। কারণ লেখায় দ্বন্দ্ব আসবেই আর সেই দ্বন্দ্বকে সমাধান করায় এক প্রাবন্ধিক বা গবেষকের প্রধান কাজ বলে আমার ধারণা।

উৎসের সন্ধান:

আকর গ্রন্থ: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরের পুতুল।

পরিচিতি

আয়ুধ

জয় বিশ্বাস

স্নাতক - পঞ্চম সেমেস্টার

অনন্যা দেঁড়ে(মালাকার)

স্নাতক - পঞ্চম সেমেস্টার

কৌস্তভ কুমার ঘোষ

স্নাতকোত্তর - তৃতীয় সেমেস্টার

শুভজিৎ দাস

স্নাতকোত্তর - তৃতীয় সেমেস্টার

নাফিসা খাতুন

প্রাক্তনী, স্নাতক

নূরনেহার বেগম

স্নাতকোত্তর - প্রথম সেমেস্টার

সুশান্ত পাত্র

প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর

মোমি সাহা

স্নাতক - তৃতীয় সেমেস্টার

সুস্মিতা দাস

স্নাতক - পঞ্চম সেমেস্টার

সৌমিলি দাস

স্নাতকোত্তর - প্রথম সেমেস্টার

মৌ ঘোষ

স্নাতক - তৃতীয় সেমেস্টার

মনিদীপা কর্মকার

প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর

সমতা ভৌমিক

স্নাতক - পঞ্চম সেমেস্টার

অভি দাস

স্নাতক - পঞ্চম সেমেস্টার

বনগোবিন্দ পত্রিকা



পত্রিকা কমিটি - ২০২১

আয়ুধ

সম্পাদক

অভি দাস ও সম্মতা ভৌমিক

কার্যকরী কমিটি

মৌ ঘোষ , মনিদীপা কর্মকার ,কৌস্তভ কুমার ঘোষ
মৌমি সাহা ,সৌমিলি দাস, সুস্মিতা দাস ,
অনন্যা দেঁড়ে(মালাকার), নাফিসা খাতুন ,
নূরনেহার বেগম ,শুভজিৎ দাস ,সুশান্ত পাত্র ।



বনগোহিন পত্রিকা

মুখ্য উপদেষ্টা

অধ্যক্ষ

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

বিভাগীয় প্রধান

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা

